ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনোরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণ সেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশীর লড়াই-এর কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালী-চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্ সংযত, কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মতো বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব জ্ঞাপন করিতে গেলে বোধহয় আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজির আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়তো অসম্ভব; তথাপি ঐ সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে-বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা।

অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আন্দোলন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অভাব। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর

যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনন্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধ মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্রজীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই;কিন্তু পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমবেশে আরও দুর্গম; কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সমগ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল। আর নতুন মসলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিরাট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন বা ইংরাজের সংস্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার

পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণদ্বারা পরত্বগ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব।—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দের মধ্যে শতকরা নব্বুইটি কার্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটি নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতগ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল, কোনো বালিকা-বিধবার মলিন মুখ দর্শনামাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই

বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য তিনি রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এসময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিত্রলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট কথা বলেন না। ... বস্তুতই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময় সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বোধকরি সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্য-পথে চালাইত, তিনি সেইপথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।

বিদ্যসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথাটা না তুলিলে চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা-বিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত, দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত, তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে? বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহার রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটিভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনো-না-কোনো প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন-সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নতুন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?